রুদ্র-মঙ্গল

রুদ্র-মঙ্গল

নিশীথ রাত্রি। সম্মুখে গভীর তিমির। পথ নাই। আলো নাই। প্রলয়-সাইক্লোনের আর্তনাদ মরণ-বিভীষিকার রক্ত-সুর বাজাচ্ছে। তারই মাঝে মাকে আমার উলঙ্গ করে টেনে নিয়ে চলেছে আর চারকাচ্ছে যে, সে দানবও নয়, দেবতাও নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ। ধীরে ধীরে পিছনে চলেছে তেত্রিশ কোটি আঁধারের যাত্রী। তারা যতবার আলো জ্বালাতে চায়, ততবারই নিভে নিভে যায়। তাদের আর্তকণ্ঠে অসহায়ের ক্রন্দন, 'বোধন না হতে মঙ্গলঘট ভেঙেছে—'। শুধু ক্রন্দন, শুধু হা-হুতাশ—শক্তি নাই, সাহস নাই।

কোথায় আঘাতের দেবতা। আঘাত কর, আঘাত কর তাদেরে, যারা চোখের সামনে মায়ের অপমান দেখে শুধু ক্রন্দন করে, প্রতিকারের পন্থার অন্বেষণে উন্মত্ত উল্লাসে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না! অবমানিত হয়ে যাদের চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত না হয়ে অশ্রুজল নির্গত হয়, তাদেরে আঘাত কর, আঘাত কর হে আঘাতের দেবতা! মারো তাদের বুকে মুখে পিঠে—মারো তাদেরে। জাগাও তাদের আত্মসম্মান। পৌরুষ তাদের হুঙ্কার দিয়ে পড়ুক অত্যাচারের বুকে।

এ কি বেদনা! এ কি ক্রন্দন! উৎপীড়িতের আর্তনাদে, 'মজলুমের ফরিয়াদে' আকাশের সারা গায়ে আজ জ্বালা, বাতাসের নিঃশ্বাসে ব্যথা, মাতা বসুমতীর বুক ফেটে নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্রাব আর ভস্মধূম। অত্যাচারীর ভীম নিষ্পেষণে বাসুকীর অচল ফণা থরথর করে কাঁপছে, এই ভূমিকম্পের কম্পিতা ধরণীকে অভয়-তরবারি এনে সান্ত্বনা দেবে, কে আছ বীর? আন তোমার প্রলয়-সুন্দর করাল-কমনীয় হস্ত। আনো তোমার রক্ত-কৃপাণের বিদ্যুৎ-হাসি, আনো তোমার মারণ-মঙ্গল অভয়-অসি! হে আমার ধ্বংসের দেবতা, একবার এই মহাপ্রলয়ের বুকে তোমার ফুলের হাসি দেখাও! স্তূপীকৃত শবের মাঝে শিবের জটার কচি শশী হেসে উঠুক! এই কুৎসিত অসুন্দর সৃষ্টিকে নাশ কর, নাশ কর হে সুন্দর রুদ্র-দেবতা! এই গলিত আর্ত সৃষ্টির প্রলয়-ভস্মটিকা পরে নবীন বেশে এসে দেখা দাও!

জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা! তোমার হাতের এ-লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মতো ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক—উলটে ফেলুক! আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ—ধুলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বল-দর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্ত-মাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা! যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়ের

তলায় আন। সকল অহঙ্কার তাদের চোখের জলে ডুবাও। নামিয়ে নিয়ে এস ঝুঁটি ধরে ঐ অর্থ-পিশাচ যক্ষগুলোকে। তোমাদের পিতৃ-পুরুষের রক্ত-মাংস-অস্থি দিয়ে ঐ যক্ষের দেউল গড়া, তোমাদের গৃহলক্ষ্মীর চোখের জল আর দুধের ছেলের হৃৎপিণ্ড নিঙড়ে তাদের ঐ লাবণ্য, ঐ কান্তি। তোমাদের অভিশাপ-তিক্ত মারি-বিষ-জ্বালা লাগিয়ে তাদের সে-কান্তি, সে-লাবণ্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও! বল নির্জিত ভাইরা আমার, বল উৎপীড়িত বোনেরা আমার, বল বেদনাতুর অভাব-ক্লিষ্ট নর-নারী—

'জয় ভৈরব জয় শঙ্কর
জয় জয় প্রলয়ঙ্কর
শঙ্কর! শঙ্কর!

মারো তোমার ত্রিশূল ছুঁড়ে, দুলাও তোমার সর্বনাশের ঝাণ্ডা, কে আছ ভৈরব-পন্থী নর-নারী, আর হাঁকো—হাঁকো,—

'জয় ভৈরব জয় শঙ্কর
জয় জয় প্রলয়ঙ্কর
শঙ্কর! শঙ্কর!'

আমার পথ

'আমার এই যাত্রা হল শুরু
ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।'

'মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে' 'জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে 'ধূমকেতু'কে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি। আমায় পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি—নমস্কার করছি আমার সত্যকে। যে-পথ আমার সত্যের বিরোধী, সে পথ ছাড়া আর কোনো পথই আমার বিপথ নয়! রাজভয়—লোকভয় কোনো ভয়ই আমায় বিপথে নিয়ে যাবে না। আমি যদি সত্যি করে আমার সত্যকে চিনে থাকি, আমার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে, তা হলে বাইরের কোন ভয়ই আমার কিছু করতে পারবে না। যার ভিতরে ভয়, সে-ই বাইরে ভয় পায়। আমার বিশ্বাস, যে নিজেকে চেনে, তার আর কাউকে চিনতে বাকি থাকে না। অতএব যে মিথ্যাকে চেনে, সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা, সে-ই মিথ্যাকে ভয় করে। নিজকে চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত

বড় একটা জোর আসে যে, সে আপন সত্য ছাড়া আর কারুকখে কুর্নিশ করে না—অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না। এই যে নিজকে চেনা আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথ-প্রদর্শক কাণ্ডারি বলে জানা, এটা দম্ভ নয়, অহঙ্কার নয়। এটা আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি। আর যদিই এটাকে কেউ ভুল করে অহঙ্কার বলে মনে করেন, তবু এটা মন্দের ভালো—অর্থাৎ মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো। অনেক সময় খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয়। ওতে মানুষকে ক্রমেই ছোট করে ফেলে, মাথা নীচু করে আনে। ও রকম মেয়েলি বিনয়ের চেয়ে অহঙ্কারের পৌরুষ অনেক—অনেক ভালো।

অতএব এই অভিশাপ-রথের সারথির স্পষ্ট কথা বলাটাকে কেউ যেন অহঙ্কার বা স্পর্ধা বলে ভুল না করেন।

স্পষ্ট কথা বলায় একটা অবিনয় নিশ্চয় থাকে ; কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা। নিজকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির উপর অটুট বিশ্বাস আসে। এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতেই শিখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজী। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না, 'আমি আছি' এই কথা না বলে সবাই বলতে লাগলাম, 'গান্ধীজী আছেন।' এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে। একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কি করে? আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়। নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপণে ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তা হলে এই তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না। আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে নিজের ভগবান মনে করার দম্ভ—আর যাই হোক, ভণ্ডামি নয়। এ-দম্ভতে শির উঁচু করে, পুরুষ করে, মনে একটা 'ডোন্ট কেয়ার'-ভাব আনে। আর যাদের এই তথাকথিত দম্ভ আছে, শুধু তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

এ-'ধূমকেতু' ঝগড়া-বিবাদ আনবে না, তবে প্রলয় যদিই আনে, তা হলে সেটার জন্যে দায়ী ধূমকেতুর দেবতা,—সারথি নয়। এ-দেশের নাড়িতে-নাড়িতে অস্থি-মজ্জায় যে পচন ধরেছে, তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না। যার ভিত্তি পচে গেছে, তাকে একদম উপড়ে ফেলে নতুন করে ভিত্তি না গাঁথলে তার ওপর ইমারত যতবার খাড়া করা যাবে, ততবারই তা পড়ে যাবে। প্রলয় আনার যে দুর্দম অসম-সাহসিকতা, 'ধূমকেতু' যদি তা না আনতে পারে, তবে তাতে অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলই আনবে বেশি।

দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনা। 'ধূমকেতু'র এমন গুরু বা এমন বিধাতা কেউ নেই, যার খাতিরে সে সত্যকে অস্বীকার করে কারুর মিথ্যা বা ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেবে। 'ধূমকেতু' সে-দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। 'ধূমকেতু' কোনো দিনই কারুর বাণীকে বেদবাক্য

বলে মেনে নেবে না, যদি তার সত্যতা প্রাণে তার সাড়া না দেয়। না বুঝে বোঝার ভণ্ডামি করে পাঁচ জনের শ্রদ্ধা আর প্রশংসা পাবার লোভ 'ধূমকেতু' কোন দিনই করবে না।

ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোন ভুল করছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেবো! কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখবার জন্যে ভুলটাকে ধরে থাকব না। তা হলে 'ধূমকেতু'র আগুন সেই দিনই নিবে যাবে। একমাত্র মিথ্যার জলই 'ধূমকেতু'-শিখাকে নিবাতে পারবে। তা ছাড়া ধূমকেতুকে কেউ নিবাতে পারবে না।

'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোন্‌খানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোনো হিংসার দুশ্‌মনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।

... দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝাণ্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।

'জয় প্রলয়ঙ্কর'

মোহর্‌রম

ফিরে এসেছে আজ সেই মোহর্‌রম—সেই নিখিল-মুসলিমের ক্রন্দন-কাৎরানির দিন। কিন্তু সত্য করে আজ কে কেঁদেছে বলতে পার হে মুসলিম? আজ তোমার চোখে অশ্রু নাই। আজ ক্রন্দন-স্মৃতি তোমার উৎসবে পরিণত! তোমার অশ্রু আজ ভণ্ডামি, ক্রন্দন আজ কৃত্রিম কর্কশ চিৎকার। 'হায় হাসান, হায় হোসেন!' বলে মিথ্যা বীভৎস চিৎকার করে আর মা ফাতেমার পুত্র-শোকাতুর আত্মাকে পীড়িত করে তুলো না। এ ক্রন্দন-অভিনয় দেখিয়ে আল্লার মুখ আর কালো করে দিয়ো না। তোমাদের ঐ যে উদ্দাম বুক-চাপড়ানির বীভৎসতা, সে ব্যর্থ হয়নি ভীরুর দল। সে-আঘাত আল্লার হাবিব হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বুকে গিয়ে বেজেছে। যাঁরা ধর্মের জন্যে সত্যের জন্যে জান কোরবান করেছেন, আজ সেই শহীদ বীরদের জন্যে ক্রন্দন-অভিনয় করে আর তাঁদের আত্মার অপমান করো না, নৃশংস অভিনেতার দল। তোমার ধর্ম নাই, অস্তিত্ব নাই, তোমার হাতে শমশের নাই, শির নাঙ্গা, তোমার কোরআন পর-পদদলিত, তোমার গর্দানে গোলামির জিঞ্জির, যে শির আল্লার আরশ ছাড়া আর কোথাও নত হয় না, সেই শিরকে জোর করে সেজদা করাচ্ছে অত্যাচারী শক্তি—, আর তুমি করছ আজ সেই শহীদদের—ধর্মের জন্য স্বাধীনতার জন্য শহীদের—'মাতমের অভিনয়! আফ্‌সোস মুসলিম! আফ্‌সোস!!

কোথায় কারবালা-মাতম তা কি দেখেছ, অন্ধ? একবার চোখ খুলে দেখ, দেখবে কোথায় কারবালার দুপুরে মাতম হাহাকার-রবে ক্রন্দন করে ফিরছে। আজ কারবালা শুধু আরবের ঐ ধূ-ধূ সাহারার বুকে নয়, ঐ ফোরাত নদীর কূলে নয়—আজ কারবালার হাহাকার ঐ নিখিল নিপীড়িত মুসলিমের বুকের সাহারায়, তোমার অপমান-জর্জরিত অশ্রু-নদীর কূলে কূলে।

মা ফাতেমা আরশের পায়া ধরে কাঁদছেন, স্কন্ধে তাঁর হাসানের বিষ-মাখা নীল পিরান আর হোসেনের খুন-মাখা রক্ত-উত্তরীয়। পুত্র-হারার আকুল ক্রন্দনে খোদার আরশ কেঁপে উঠছে। হে যুগে-যুগে শোক-অভিনেতা মুসলিমের দল! থামাও—থামাও মা ফাতেমার ক্রন্দন—থামাও আল্লার আরশের ভীতি-কম্পন। তোমার স্বাধীনতাকে তোমার সত্যকে তোমার ধর্মকে যে-এজিদের বংশধরেরা লাঞ্ছিত নিপীড়িত করছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের ভূ-অবলুণ্ঠিত শির উঁচু হয়ে উঠুক। তোমার ইসলামকে অক্ষতদেহ উন্নত-শির করে রাখ, তোমার স্বাধীনতা তোমার সত্যকে রক্ষা কর, দেখবে পুত্র-শোকাতুরা জননী মা ফাতেমার ক্রন্দন থেমে গিয়েছে, আল্লার আরশের কম্পন থেমেছে। ঐ শোন কাসেমের অতৃপ্ত আত্মা ফরিয়াদ করে ফিরছে—'তৃষ্ণা, তৃষ্ণা!' কে দেবে এ-তৃষ্ণাতুর তরুণকে তৃষ্ণার জল? এ-তৃষ্ণা আবে-জমজম আবে-কওসরেও মিটবার নয়। এ-কারবালার মরু-দগ্ধ পিয়াসী চায় নিখিল-মুসলিম তরুণের রক্ত, ধর্ম আর স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রাণ-বলিদান। কে আছ অরুণ-খুনের তরুণ শহীদ মুসলিম, কাসেমের এ-তৃষ্ণা এ-ক্রন্দন-তিক্ততা মেটাবে?

ঐ শোনো সদ্য স্বামীহারা বালিকা সকিনার মর্মভেদী ক্রন্দন, সে চায় না তার স্বামী কাসেমের প্রাণ, সে চায় ইসলামের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যে কাসেমের মত প্রাণ-বলিদান।

আজ নিখিল মুসলিম-অঙ্গন তোমার কারবালা-প্রান্তরে হে মুসলিম! তার মাঝে আকুল অবিশ্রাম ক্রন্দন গুমরে ফিরছে—'তৃষ্ণা—তৃষ্ণা!'

আল্লার পানে তাকাও, রসূলের দিকে চেয়ে দেখ, মা ফাতেমা, হজরত আলীর মাতম শোনো, কাসেমের, সকিনার—অতৃপ্তির আকুল কাঁদন-রণরণি শোনো, কচি শিশু আসগরের তীর-বেঁধা কাঁচা কলিজার খুন-খারাবির কথা স্মরণ কর, আর তোমার কর্তব্য নির্ধারণ কর, হে মুসলিম! মোহরমের খুন-খারাবি আজ তোমার লক্ষ্য স্থির করে দিল।

বিষ-বাণী

মাভৈ! মাভৈ!! ভয় নাই, ভয় নাই—ওগো আমার বিষ-মুখ অগ্নি-নাগ-নাগিনীপুঞ্জ! দোলা দাও, দোলা দাও তোমাদের কুটিল ফণায় ফণায়। তোমাদের যুগ যুগ-সঞ্চিত কাল-বিষ আপন আপন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে ফেল। তোমাদের বিভূতি-বরণ অঙ্গ কাঁচা বিষের গাঢ় সবুজ রাগে রেঙে উঠুক। বিষ সঞ্চয় কর, বিষ সঞ্চয় কর—হে আমার

তিক্ত-চিত ভুজগ তরুণ দল! তোমাদের ধরবে কে? মারবে কে? যে ধরতে আসবে, তার হাড়-মাংস খসে খসে পড়বে উগ্র বিষের দাহনে। কোন্ দুঃসাহসী বন্দী করবে তোমাদেরে? কারার লৌহদণ্ড দারুণ বিষ-দাহনে খসে গলে পড়বে। অত্যুগ্র নিশ্বাস-বহ্নিতে কারার কন্দরে-কন্দরে ধুধু ধুধু করে আগুন—আগুন জ্বলে উঠবে। তোমার তড়িৎ-জিহ্বার মুহূর্ত-ইঙ্গিতে জল্লাদের হাতের খড়গ টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে, ফাঁসির রজ্জু ভস্ম হয়ে যাবে। বিষ সঞ্চয় কর, হে আমার হলাহল-পুরবাসী কূট নাগ-নাগিনী-কুল। এত বিষ এমন বিষ—যা শুধু জ্যান্ত অবস্থাতেই অত্যাচারকে দগ্ধে মারবে না, মরবার পরও যে বিষ শাশ্বত সম-তেজা সম-উগ্র হয়ে থাকবে। নিদাঘ মধ্যাহ্নের তাপ-দগ্ধ রুদ্র-বৈশাখী ঝড়ে ঝড়ে চিতায়-ভস্মীভূত তোমাদের বিষ স্ফুলিঙ্গ উড়ে বেড়াবে দিগন্তের কোলে কোলে—গৃহীর প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, বলদর্পীর মহলে-মহলে। মা ডুকরে কেঁদে উঠবে, আর জ্বালায় শিশু-পুত্র তার আর্তনাদ করে করে নীল হয়ে, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে মাতৃক্রোড়ে মরতে থাকবে, যেমন কারবালার কচি শিশু আসগর 'তৃষ্ণা তৃষ্ণা' করে জহরমাখা তীর খেয়ে মরেছিল!

তোমাদের গোরস্থানে তোমাদের শ্মশানে বিষ-বায়ু দিনে ঘূর্ণিরূপে শিশ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে, আর রাতে অনির্বাণ আলেয়া-শিখা হয়ে নেচে নেচে বেড়াবে। ওই শ্মশানে, ওই গোরস্তানে যে যাবে, সে আর জ্যান্ত ফিরে আসবে না।

মরেও তোমাদের বিষ যাবে না, প্রতি অস্থিকণায়, প্রতি মৃত্তিকা-পরমাণুতে তোমাদের উদ্‌গারিত কূট-হলাহল মিশ্রিত থাকবে। সে-অস্থি যার গায়ে বিঁধবে, সে-দগ্ধ মৃত্তিকার যার গায়ে ছোঁওয়া লাগবে সে তখনি বিষ-জর্জরিত, ভস্ম হয়ে যাবে। চাই এত জ্বালাময় হলাহল, এমনি মারিভয়-হানা মারিবিষ। তোমাদের দেহ হবে সহস্র বৃশ্চিক-যুক্ত কোটি হুল-বহুল। যে তোমাদের বাঁধতে আসবে, ঐ সহস্র বৃশ্চিক-যুক্ত কোটি হুল এক সাথে তাকে উগ্র রোষে দংশন হানবে।

* * *

আমাদের কাছে প্রেম ভণ্ডামি, করুণা বিদ্রূপ, প্রণয় কশাঘাত, প্রীতি ভীরুতা।

আমাদের বিবাহের লাল চেলি দেশশত্রুর আঘাত-রক্ত-রাঙা উত্তরীয়, ফাঁসির রশি আমাদের প্রিয়ার ভুজবন্ধন।

শব দেখে আমাদের গৃহত্যাগ, রক্ত-ঝরা প্রাণ, ঝাঁজরা-করা বক্ষ নিয়ে রণাঙ্গনে আমাদের আরাম-শয়ন। বুকে প্রতিদ্বন্দ্বীর বেয়নেটের সঙ্গীন-ঘাত, সে যেন আমাদের মাতৃহারা পুত্রের অভিমান-মার। স্কন্ধে ঘাতকের ভীম খড়গাঘাত, সে যেন আমাদের প্রিয়ার কোল হতে দুষ্টু আদরিণী মেয়ের ঝাঁপিয়ে পড়া।

আমরা অবিনশ্বর। আমাদের একজন যায়, একশো জন আসে। আমাদের একবিন্দু রক্ত ভূতলে পড়লে একলক্ষ বিদ্রোহী নাগশিশু বসুমতী বিদীর্ণ করে উঠে আসে। আমরা

অদম্য। আমাদের একজন বাঁধা পড়লে একশো জন ছাড়া পায়, সহস্র ভুজগ ছুটে এসে তার স্থান পূর্ণ করে।

আমরা দেশ-শত্রু বিভীষণের মহাকালান্তক কাল। আমরা অকাট্য ব্রহ্মশাপ! পরীক্ষিতের মত, লখিন্দরের মত দুর্ভেদ্য ছিদ্রহীন দুর্গের মধ্যে থাকলেও দেশবিদ্রোহীকে আমরা তক্ষক হয়ে, সূত্ররূপী কালসাপ হয়ে দংশন করি।

আমাদের বিদ্রোহ যারা দেশ জয় করেছে তাদের উপর নয়, আমাদের বিদ্রোহ দেশদ্রোহীদের উপর। যখন আইরিশ তরুণ দেশদ্রোহী রবার্ট এমেটকে ফাঁসি দিয়ে তাকে তিন খণ্ড করে কেটে রাস্তার মোড়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তার সেই খণ্ডিত দেহে লেখা হয়েছিল, 'How a traitor should be treated'—দেখো, দেশদ্রোহীর দুর্দশার কথা স্মরণ করো, হে দেশদ্রোহী মাতৃহন্তা বিভীষণের দল।

তোমাদের নামে শেষ ঘণ্টা বেজেছে মায়ের রক্ত-মন্দির অঙ্গনে। তোমাদের বিরুদ্ধে অসুর-নাশিনী দনুজ-দলনী মা-র রক্ত-তৃষাতুর জিহ্বা লক-লক করে উঠেছে।

এসো আমার মণিহারা কালফণীর দল, তোমাদের প্রেমের কেতকী-কুঞ্জ ছেড়ে, অন্ধকার বিবর ত্যাগ করে, এসো মায়ের আমার শ্মশান-শায়িত আঘাত-জর্জরিত মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে। হয় মৃত্যু-সঞ্জীবনী আনো, নয় ভালো করে চিতাগ্নি জ্বলে উঠুক! বলো, মাভৈ! মাভৈ!! বলো—

হর হর শংকর
বলো, জয় ভৈরব জয় শংকর
জয় জয় প্রলয়ংকর
শংকর! শংকর!!

ক্ষুদিরামের মা

ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময়ের একটা গানে আছে, ক্ষুদিরাম বলছে—

'আঠার মাসের পরে
জনম নেব মাসীর ঘরে, মা গো,
চিনতে যদি না পার মা
দেখবে গলায় ফাঁসি—'

সেই হারা-ক্রন্দনের আশ্বাস-গান শুনে আজো অতি বড় পাষাণী মেয়েরও চোখে জল আসে, গা শিউরে ওঠে। আমাদের মত কাপালিকেরও রক্ত-আঁখি আঁখির সলিলে টলটল করে ওঠে। কিন্তু বলতে পার কি দেশের জননীরা, আমাদের সেই হারা-ক্ষুদিরাম তোমাদের কার ঘরে এসেছে? তোমরা একবার তোমাদের আপন আপন ছেলের কণ্ঠের

পানে তাকাও, দেখবে—তাদের প্রত্যেকের গলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসির নীল দাগ। ক্ষুদিরাম ছিল মাতৃহারা। সে কোন্ মাকে ডেকে আবার আসবে বলে আশ্বাস দিয়ে গেছে, কেঁদে গেছে, তা যদি বুঝতে বাংলার মা'রা, তা হলে তোমাদের প্রত্যেকটি ছেলে আজ ক্ষুদিরাম হত। ক্ষুদিরাম ছেলেবেলায় মা হারিয়ে—পেয়েছিল সারা দেশের মায়েদের। মায়ের স্নেহের ক্ষুধা তার মেটেনি, তোমাদের সকলকে মা বলে ডেকেও সে তৃপ্ত হয়নি, তাই আবার আসব বলে কেঁদে গেছে। এবার অভিমানী ছেলে মায়ের ঘরে আসবে না, মাসীর ঘরে আসবে। কিন্তু অভিমানী হলে কি হয়, ও ছিল বোকা ছেলে, তাই বুঝতে পারেনি যে, মাসীর ঘর বলে অভিমান করে যার ঘরে আসতে চেয়েছে, সেও যে মায়েরই ঘর।

মায়ের সাড়া পায় নাই, মারা তাকে কোলে নেয়নি, তাই অভিমানে সে আত্মবলিদান দিয়ে আত্ম-নির্যাতন করে মায়েদের অনাদরের প্রতিশোধ নিয়েছে। যাবার বেলায় দস্যি ছেলে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে গেল না। হায় হতভাগা ছেলে! কার জন্যে সে কাঁদবে? যার জন্যে কাঁদবার কেউ নেই, তার চোখের জল যে লজ্জা, তার কাঁদাটাও যে অপমান। দস্যিছেলে সব চোখের জলকে কণ্ঠের নিচে ঠেলে রাখলে। ফাঁসি পরে নীলকণ্ঠ হবার আগেই ব্যথায় নীলকণ্ঠ হয়ে গেল। প্রাণের তিক্ত ক্রন্দনের জ্বালা তার কেউ দেখলে না, দেখলে শুধু কিশোর ঠোঁটের অপূর্ব হাসি। ফাঁসি হতে আর দুচার মিনিট বাকি, তখনও সে তার নিজের ফাঁসির রশির সমালোচনা নিয়ে ব্যস্ত যে, ফাঁসির রজ্জুতে মোম দেওয়া হয় কেন! তোমরা কি ভাবছ মা যে, কি সাংঘাতিক ছেলে বাপু! কিন্তু ছেলে যতই সাংঘাতিক হোক, সত্যি করে বল দেখি, ঐ মাতৃহারা তোমাদেরই মুক্তির জন্য ফাঁসিতে যাওয়ার কথা শোনার পরেও কি তোমরা নিজেদের দুলালদেরে বুকে করে শুয়ে থাকতে যন্ত্রণা পাও না? ঐ মাতৃহারা মরা লাশ কি তোমাদের মা ও ছেলের মধ্যে এসে শুয়ে একটা ব্যবধানের পীড়া দেয় না? নিজের ছেলেকে যখন আদর করে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় যাবতীয় সামগ্রী খাওয়াও, নিবিড় স্নেহে বুকে চেপে ধরে শুয়ে ঘুম পাড়াও, একটু অসুখ করলে তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মাথা খোঁড়, তখন কি এই মাতৃহীন ক্ষুদিরামের কথা—তারই মত আরো সব লক্ষ্মীছাড়া মাতৃহারাদের কথা মনে হয়ে তোমাদের বুকে কাঁটার মত বেঁধে না? তোমাদের এত স্নেহ এত মায়া কি অনুশোচনায়, লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠে না? বল মা, উত্তর দাও! আজ ঐ ক্ষুদিরামের মত শত লক্ষ্মীছাড়া ছেলে এসে তোমাদেরে তোমাদের মাতৃহৃদয়ের নামে জিজ্ঞাসা করছে, উত্তর দাও! জানি, উত্তর দিতে পারবে না, মুখে কথা ফুটবে না। তুমি বলতে যাবে, কিন্তু অমনি তোমার মনের মা তোমার মুখ টিপে ধরবে।

মানুষের মন আর আত্মা এমনি বালাই যে, পরের দুঃখ দেখে তার নিজের ভোগ বিস্বাদ হয়ে ওঠে, বিশেষ করে মা-দের। মাতৃহারা এক পাশে দাঁড়িয়ে জল-ছলছল চোখে যদি চায়, তাহলে তোমার হাত উঠবে না তোমার ছেলের মুখে কিছু তুলে দিতে, আপনি শিথিল হয়ে যাবে। এটাও সওয়া যায়। কিন্তু যদি কোনো মাতৃহারা বিদ্রোহ করে কারুর কাছে কিছু না চায়, মাথা উঁচু করে কোনো মায়ের ঘরের পানে না তাকিয়ে তার

রুক্ষ কেশ লক্ষ্মীছাড়া মূর্তির রুদ্রকেতন উড়িয়ে চলে যায়, ডাকলেও ঘরের পানে তাকায় না, মায়ের ডাকে চোখ ছলছল না করে উল্টো আত্মনির্যাতন করে তোমাদের চোখের সামনে,—তাহলে মায়ের মন কেমন করে ওঠে বল দেখি? হে আমার দেশের জননীরা! তোমাদের কাছে এসেছে তেমনি বিদ্রোহী লক্ষ্মীছাড়া মাতৃহারার দল, তাদের হারানো ক্ষুদিরামকে খুঁজে নিতে। ভয় করো না, বিদ্রূপ করো না এদের মা, এরা ভিখারি ছেলে নয়। আমরা তোমাদের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে আসিনি, আসবও না। আমরা এসেছি আমাদের দাবি নিয়ে, আমাদের হারানো ক্ষুদিরামকে ফিরে নিতে। সে যে আমাদের মাতৃহারার দলের, সে মায়ের দলের নয়।

ক্ষুদিরাম গেছে, কিন্তু সে ঘরে ঘরে জন্ম নিয়ে এসেছে কোটি কোটি ক্ষুদিরাম হয়ে। তোমরা চিনতে পারছ না, তোমরা মায়ায় আবদ্ধ। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাদের ক্ষুদিরামকে—তোমাদের ছেলেদের ছেড়ে দাও, ওরা আমাদের—আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দলের। ওরা মায়েদের নয়, ওরা ঘরের নয়, ওরা বনের। ওরা হাসির নয়, ফাঁসির। ঐ যে কণ্ঠে হাত দিয়ে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরছ, ঐ কণ্ঠে ফাঁসির নীল দাগ লুকানো আছে। ওরা তোমার নয়, আমার নয়, ওরা দেশের, ওরা বলিদানের, ওরা পূজার!

কোথায় ভাই ক্ষুদিরাম? আঠার মাসের পরে আসবে বলে গেছ, এসেওছ হয়তো প্রতি ঘরে ঘরে। কিন্তু আঠার বছর যে কেটে গেল ভাই, সাড়া দাও সাড়া দাও আবার, যেমন যুগে যুগে সাড়া দিয়েছ ঐ ফাঁসি-মণ্ডপের রক্ত-মঞ্চে দাঁড়িয়ে। তোমার সাথে আমাদের বারবার দেখাশুনা ঐ ফাঁসি-পরা হাসিমুখে! আর একবার সাড়া দিয়েছিলে তুমি আয়ার্ল্যান্ডে রবার্ট এমেট নামে। সেদিনো এমনি তরুণ বয়সে তুমি ফাঁসির কৃষ্ণ-আলিঙ্গন, খড়্গের সুনীল চুম্বন পেয়েছিলে। হারা-প্রিয়া 'সারা'র আলিঙ্গনপরশ তোমার জন্য নয়, কমলার প্রসাদ তোমার জন্য নয়, তোমার প্রিয়ায় তুমি এমনি বারে বারে পাবে আবার বারে বারেই হারাবে, তোমার প্রিয়ার চেয়েও প্রিয়তম ঐ ফাঁসির রশি। কোথায় কোন্ মাতৃ-বক্ষে কোন্ 'সারা'র কোন্ কমলার কুঞ্জে আপন ভুলেছ, হে ক্ষুদিরামের জাগ্রত আত্মা! সাড়া দাও। সাড়া দাও! এস আবার ফাঁসিমঞ্চে, আর একবার নতুন করে আমাদের সেই চির-নূতন চির-পুরাতন গান ধরি—

'আঠার মাসের পরে,
জনম নেব মাসীর ঘরে, মাগো!
চিনতে যদি না পার মা,
দেখবে গলায় ফাঁসি!'

'ধূমকেতু'র পথ

অনেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন, 'ধূমকেতু'-র পথ কি? সে কী বলতে চায়? এর দিয়ে কোন মঙ্গল আসবে ইত্যাদি।

নীচে মোটামুটি 'ধূমকেতু'র পথ নির্দেশ করছি।

প্রথম সংখ্যায় ধূমকেতুতে 'সারথির পথের খবর' প্রবন্ধে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করেছিলাম, যা বলতে চাই, তা বেশ ফুটে ওঠে নি মনের চপলতার জন্য। আজও হয়ত নিজেকে যেমনটি চাই তেমনটি প্রকাশ করতে পারব না, তবে এই প্রকাশের পীড়ার থেকেই আমার বলতে-না-পারা বাণী অনেকেই বুঝে নেবেন—আশা করি। পূর্ণ সৃষ্টিকে প্রকাশ করে দেখাবার শক্তি হয়ত ভগবানেরও নেই, কোনও স্রষ্টারও নেই। মানুষ অপ্রকাশকে আপন মনের পূর্ণতা দিয়ে পূর্ণ করে দেখে।

সর্বপ্রথম, 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লি করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ-দেশে মোড়লি করে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদেরে পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুঁটলি বেধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদেরো এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।

পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।

আর এই বিদ্রোহ করতে হলে—সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে,—

'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ!'

বলতে হবে,—

'যে যায় যাক সে, আমার হয়নি লয়!'

কথাটা শুনতে হয়তো একটু বড় রকমের হয়ে গেল। একটু সহজ করে বলবার চেষ্টা করি। আর এইটাই ধূমকেতুর সবচেয়ে বড় বলা।

আমি যতটুকু বুঝতে পারি, তার বেশি বুঝবার ভান করে যেন কারুর শ্রদ্ধা বা প্রশংসা পাবার লোভ না করি। তা সে মহাত্মা গান্ধীরই মতো হোক আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরই মত হোক, কিংবা ঋষি অরবিন্দেরই মত হোক, আমি সত্যিকার প্রাণ থেকে যেটুকু সাড়া পাই রবীন্দ্র, অরবিন্দ বা গান্ধীর বাণীর আহ্বান ঠিক ততটুকু মানবো। তাঁদের বাণীর আহ্বান যদি আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি না তোলে, তবে তাঁদের মানব না। এবং এই 'মানি না' কথাটা সকলের কাছে মাথা উঁচু করে স্বীকার করতে হবে। এতে হয়তো লোকের অনেক নিন্দা-বদনাম-অপবাদ শুনতে হবে, কিন্তু আমি আমার কাছে ঠিক থাকব। তাঁদেরে বা তাঁদের মত ঠিক না বুঝেও যদি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, আমি গান্ধী-ভক্ত, রবীন্দ্র-ভক্ত বা অরবিন্দ-ভক্ত, তাতে অনেকের শ্রদ্ধা প্রশংসা লাভ করবো, কিন্তু আসলে ত সেটা ফাঁকি দিয়ে নেওয়া। এতে অন্যকে প্রবঞ্চনা করে খুব বাহ্বা নিতে পারি, কিন্তু আমার অন্তরের দেবতা অর্থাৎ আমার আমি তাতে দিন দিন ক্লিষ্ট-পীড়িতই হয়ে উঠবে। অন্যায় করলে, পাপ করলে অন্তরে যে পীড়া উপস্থিত হয়, মানুষের সেইটুকুই সচেতন ভগবান, সেইটুকুই জাগ্রত সত্য।

সকলেরই অন্তরে এমন একটা কিছু আছে, যেটা মিথ্যা সইতে পারে না। তা নিজেরই হোক আর পরেরই হোক। সেটাকে সব সময় হয়তো জিদের বশে স্বীকার করি না, কিন্তু নিজেকে ত আর ফাঁকি দেওয়া চলে না।

যখন ফাঁকি দিয়ে লোকের কাছ থেকে বাহ্বা নিয়ে ঘরে ফিরি, তখন আমার ঐ বাহ্বা অর্জনের ফাঁকির কথা মনে হয়ে প্রাণে যেন কেমন এক অসোয়াস্তি কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। ঐ অসোয়াস্তিই হচ্ছে অনুশোচনা বা অনুতাপ। যাকে সদাসর্বদা তার কৃতকর্মের বা হঠকারিতার জন্য এই রকম অনুশোচনা বা অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হতে হয়, সে ক্রমেই ভীরু, কাপুরুষ হয়ে যেতে থাকে, সে তখন বাক্-সর্বস্ব হয়ে ওঠে। তা দিয়ে আর কোনো দিন কোনো বড় কিছুর আশা করা যায় না। আমাদের সকলের মধ্যে নিরন্তর এই ফাঁকির লীলা চলেছে। আর বাংলা হয়ে পড়েছে ফাঁকির বৃন্দাবন। কর্ম চাই সত্য, কিন্তু কর্মে নামবার বা নামাবার আগে এই শিক্ষাটুকু ছেলেদেরে, লোকদেরে রীতিমত দিতে হবে যে, তারা যেন নিজকে ফাঁকি দিতে না শেখে, আত্মপ্রবঞ্চনা করে করে নিজেকেই পীড়িত করে না তোলে।

আমি জীবনে অনেক আত্মপ্রবঞ্চনা করে করে অন্তরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছি, কত রাত্রি অনুশোচনায় ঘুম হয় নাই। এখন সে-সব ভুল বুঝতে পেরেছি। এখন সোজা এই বুঝেছি যে, আমি যা ভাল বুঝি, যা সত্য বুঝি, শুধু সেইটুকু প্রকাশ করবো, বলে বেড়াবো, তাতে লোকে নিন্দা যতই করুক, আমি আমার কাছে আর ছোট হয়ে থাকবো না, আত্ম-প্রবঞ্চনা করে আর আত্ম-নির্যাতন ভোগ করবো না।

যাঁকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, তাঁকে বুঝবার ভান করলে তাঁকে অপমানই করা হয়। কারণ, পূজা মানে দেবতাকে সত্যি করে চিনে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া। যাঁকে

আমি সত্য করে বুঝতে পারিনি, তাঁকে পূজা করতে যাওয়া তাঁর অপমান করা। মিথ্যা মন্ত্রের উচ্চারণে দেবতা পীড়িতই হয়ে ওঠেন দিন দিন, প্রসাদ দেন না।

কিন্তু মানুষের এমনই দুর্বলতা যে, এই শ্রদ্ধা-প্রশংসা পাওয়ার লোভটুকুকে কিছুতেই সে জয় করতে পারছে না। সমাজ থেকে সমাজের শ্রদ্ধা লাভের জন্য তাকে জেনে-শুনে অনেক মিথ্যা আচরণ করতে হয়। 'ধূমকেতু' এখন এইটুকু প্রচার করতে চায় যে, দেশ-উদ্ধারের জন্য যারা সৈনিক হতে চায়, অন্তত তারা যেন সর্বাগ্রে এই দুর্বলতা, এই লোভটুকু জয় করবার ক্ষমতা অর্জন ক'রে তবে কোনো কাজে নামে। সত্যিকার প্রাণ না নিয়ে কাজে নামলে তাতে কাজ পণ্ডই হয় বেশি।

অনেকেই লোভের বা নামের জন্য মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে নেমেছিলেন। কিন্তু আত্ম-প্রবঞ্চনা নিয়ে নেমেছিলেন বলে অন্তর থেকে সত্যের জোর পেলেন না, আপনি সরে পড়লেন। রবীন্দ্র-অরবিন্দ-ভক্তদের মধ্যেও ঐ একই প্রবঞ্চনা-ফাঁকি এসে পড়েছে। এরা অন্ধভক্ত, চোখওয়ালা ভক্ত নয়, বীর-ভক্ত নয়। এরা বুঝেও বুঝে না যে, পূজার নামে এরা তাঁদেরে অপমান করছে, বড় করবার নামে তাঁদেরে লোকচক্ষুতে আরো খাটোই করে তুলছে। এদের এতটুকু দুঃসাহস নেই যে, যেটুকু বুঝতে পারছে না সেটুকু 'বুঝতে পারছি নি' বলে বুঝে নিতে, পাছে তাঁর গুরুর কাছে সে কম বুদ্ধিমান হয়ে পড়ে বা গুরুর রোষদৃষ্টিতে পড়ে। এসব অন্ধলোক দিয়ে কোনো কাজ হবে না। কেননা, অন্তরে মিথ্যা আর ফাঁকি নিয়ে কাজে নামলে কাজেও মস্ত ফাঁক পড়ে যায়। যাঁকে বুঝি না, যাঁর মত বুঝতে পারি না, তাঁর মুখের সামনে মাথা উঁচু করে বলতে হবে যে, আপনার মত বুঝতে পারছি নে বা আপনার এ-মত এই-এই কারণে ভুল। তাতে যিনি সত্যকার দেবতা, তিনি কখনই রুষ্ট হবেন না, বরং তোমার সরলতা ও সত্য-প্রিয়তার দুঃসাহসিকতার জন্য শ্রদ্ধাই করবেন। বিদ্রোহ মানে কাউকে না-মানা নয়, বিদ্রোহ মানে যেটা বুঝি না, সেটাকে মাথা উঁচু করে 'বুঝি না' বলা। যে-লোক তার নিজের কাজের জন্য নিজের কাছে লজ্জিত নয়, সে ক্রমেই উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে স্বর্গের পথে উঠে চলবেই চলবে। আর যাকে পদে পদে তার ফাঁকি আর মিথ্যার জন্য কুণ্ঠিত হয়ে চলতে হয়, সে ক্রমেই নিচের দিকে নামতে থাকে, এইটাই নরক-যন্ত্রণা। আমার বিশ্বাস, আত্মার তৃপ্তিই স্বর্গসুখ, আর আত্মপ্রবঞ্চনার পীড়াই নরক-যন্ত্রণা। 'ধূমকেতু'র মত হচ্ছে এই যে, তোমার মন যা চায়, তাই কর। ধর্ম, সমাজ, রাজা, দেবতা কাউকে মেনো না। নিজের মনের শাসন মেনে চল। গান্ধির মত যদি প্রাণ থেকে না মানতে পার, বাস, লোকের নিন্দা-বদনামের ভয়ে তা মেনো না, রবীন্দ্র-অরবিন্দের মত ঠিক মেনে নিতে পারছ না, বাস, মাথা উঁচু করে বল, 'বুঝতে পারছি না'। অন্ধ-ভক্তির অন্ধতায় যা বোঝ না তা 'বুঝি না' বল, দেখবে অপূর্ব তৃপ্তি-পুলকে আত্মা তোমার কানায় কানায় ভরে উঠছে। তখন নিন্দা-অপমান তোমার গায়ে লাগবে না।

ইংরেজের সহযোগিতা করে যদি দেশ উদ্ধার হবে তুমি প্রাণ হতে নিজকে ফাঁকি না দিয়ে বিশ্বাস কর, তবে তাই কর, কারুর নিন্দা ও অপবাদকে ভয় করো না। কিংবা যদি

তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করলে দেশের মুক্তি হবে না মনে কর, তাই বল বুক ফুলিয়ে। অত্যাচারীকে অত্যাচারী বল। তাতে আসে আসুক বাইরের নির্যাতন, ইংরাজের মার, তাতে তোমার অন্তরের আত্মপ্রসাদ আরো বেড়েই চলবে !

মিথ্যাকে মিথ্যা বললে, অত্যাচারীকে অত্যাচারী বললে যদি নির্যাতন ভোগ করতে হয়, তাতে তোমার আসল নির্যাতন ঐ অন্তরের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। প্রাণের আত্মপ্রসাদ যখন বিপুল হয়ে ওঠে, তখন নির্যাতকের আগুন ঐ আনন্দের এক ফুঁতে নিবে যায়। ইব্‌রাহিম যখন বিদ্রোহী হয়ে নমরুদের অত্যাচারকে অত্যাচার আর তার মিথ্যাকে মিথ্যা বলে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন, তখন নমরুদ তাঁকে ধরে এক বিরাট অগ্নি-জাহান্নামের সৃষ্টি করে তাতে নিক্ষেপ করলে। কিন্তু ইব্‌রাহিমের কোথাও ফাঁকি ছিল না বলে সত্যের জোর ছিল বলে তাঁর আত্মপ্রসাদ ঐ বিপুল আনন্দের এক ফুঁতে সমস্ত জাহান্নাম ফুল হয়ে হেসে উঠল। ইব্‌রাহিমের মনে যদি এতটুকু ফাঁকি থাকত, তবে তখনই নমরুদের আগুন তাকে ভস্মীভূত করে দিত।

ভগবানের বুকে লাথি মারবার অসমসাহসিকতা নিয়ে বেরিয়েছিলেন মহাবিদ্রোহী ভৃগু। কেননা সে তাঁকে বোঝেনি, তাঁর ভুলকে ভুল বলে শোধরাবার চেষ্টা করেছিল, ভগবান যখন তা শুনলেন না, ঘুমিয়ে রইলেন তখন ভৃগু ভগবানের বুকে লাথি মেরে জাগালে। ভগবানও ভৃগুর পদ-চিহ্ন সগৌরবে বক্ষে ধারণ করলেন। ভাবতে চক্ষে জল আসে। কিন্তু ভগবানের যারা বিদ্রোহী নয়, গো-বেচারি ভক্ত, ভগবানকে প্রভু ভেবে জনম-জনম কাটিয়ে দিলে সাধনায়, তাদেরে হয়তো সিদ্ধি তিনি দিলেন, কিন্তু তাদের কারুর পদাঘাত বুকে ধারণ করে দেখালেন না। এর আসল মানে হচ্ছে, সত্যকে জানবার যার বিপুল সত্য ইচ্ছা থাকে, তার আঘাতও সত্য সহ্য করে, বুকে করে নিয়ে তার সত্য-নিষ্ঠা, সত্য জাগাবার আকাঙ্ক্ষাকে জগতের ভীরু কাপুরুষ ভণ্ড-ভক্তদের চোখের সামনে দেখায় যে, এই ফাঁকির পূজারীর ক্রন্দনে সত্য জাগে না। সত্যকে জাগাবার জন্য বিদ্রোহ চাই, নিজেকে শ্রদ্ধা-প্রশংসার লোভ থেকে রেহাই দেওয়া চাই।

মন্দির ও মসজিদ

'মারো শালা যবনদের !' 'মারো শালা কাফেরদের !'—আবার হিন্দু মুসলমানি কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর মাথা-ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম—তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরাণীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি

পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে,—'বাবা গো, মা গো !'—মাতৃ-পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে !

দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।

মন্দির-মসজিদের ললাটে লেখা এই রক্তকলঙ্ক-রেখা কে মুছিয়া ফেলিবে, বীর? ভবিষ্যৎ তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে !

সেই রুদ্র আসিতেছেন, যিনি ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ঐ মন্দির-মসজিদ-গির্জা ভাঙিয়া সকল মানুষকে এক আকাশের গম্বুজ-তলে লইয়া আসিবেন।

জানি, স্রষ্টার আপনি-মোড়ল 'প্রাইভেট সেক্রেটারি'রা হ্যাট খুলিয়া, টুপি তুলিয়া, টিকি নাচাইয়া আমায় তাড়না করিবে, তবু ইহাদের পতন হইবে। ইহারা ধর্ম-মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের এল্‌কোহল পান করিয়াছে।

পুসিফুট জনসন মাতালদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বহু মার খাইয়াছেন।

মুহম্মদকে যাহারা মারিয়াছিল, ঈসা-মুসাকে যেসব ধর্ম-মাতাল প্রহার করিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধর আবার মারিতেছে মানুষকে—ঈসা-মুসা-মুহম্মদের মত মানুষকে।

যেসব অবতার-পয়গম্বর মানুষের মার হইতে মানুষকে বাঁচাইতে আসিয়া মানুষের মার খাইয়া গেলেন, তাঁহারা আজ কোথায়? মানুষের কল্যাণের জন্য আসিয়াছিলেন যাঁহারা, তাঁহাদেরই মাতাল পশু শিষ্যেরা আজ মানুষের সর্ব অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠিল।

যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিন আজ মন্দিরের কারাগারে, মসজিদের জিন্দান-খানায়, গির্জার gaol-এ বন্দী। মোল্লা-পুরুত, পাদরি-ভিক্ষু জেল-ওয়ার্ডের মতো তাহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে।

একস্থানে দেখিলাম, উনপঞ্চাশ জন ভদ্র-অভদ্র হিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে, আর একস্থানে দেখিলাম, প্রায় ঐ সংখ্যক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মতো মারিতেছে। দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল অসহায় মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে যেমন করিয়া বুনো জংলি বর্বরেরা শূকরকে খোঁচাইয়া মারে। উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শূকরের চেয়েও কুৎসিত ! হিংসায়, কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ !

উহাদের দুই দলেরই নেতা একজন, তাহার আসল নাম শয়তান। সে নাম ভাঁড়াইয়া কখনো টুপি পরিয়া পর-দাড়ি লাগাইয়া মুসলমানদের খেপাইয়া আসিতেছে, কখনো পর-টিকি বাঁধিয়া হিন্দুদের লেলাইয়া দিতেছে, সে-ই আবার গোরা সিপাই গুর্খা সিপাই হইয়া হিন্দু-মুসলমানদের গুলি মারিতেছে ! উহার ল্যাজ সমুদ্রপারে গিয়া ঠেকিয়াছে, উহার মুখ সমুদ্রপারের বুনো বাঁদরের মত লাল !

দেখিলাম, আল্লার মসজিদ আল্লা আসিয়া রক্ষা করিলেন না, মা-কালীর মন্দির কালী আসিয়া আগলাইলেন না ! মন্দিরের চূড়া ভাঙিল, মসজিদের গুম্বজ টুটিল !

আল্লার এবং কালীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আকাশ হইতে বজ্রাঘাত হইল না মুসলমানদের শিরে, 'আবাবিলের' প্রস্তর-বৃষ্টি হইল না হিন্দুদের মাথার উপর।

এই গোলমালের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ছেলে আসিয়া গোঁফ-দাড়ি-কামানো দাঙ্গায়-হত খায়রু মিয়াকে হিন্দু মনে করিয়া 'বল হরি হরিবোল' বলিয়া শ্মশানে পুড়াইতে লইয়া গেল, এবং কতকগুলি মুসলমান ছেলে গুলি খাইয়া হত দাড়িওয়ালা সদানন্দ বাবুকে মুসলমান ভাবিয়া 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়িতে পড়িতে কবর দিতে লইয়া গেল।

মন্দির এবং মসজিদ চিড় খাইয়া উঠিল, মনে হইল যেন উহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে !

মারামারি চলিতেছে। উহারি মধ্যে এক জীর্ণা-শীর্ণা ভিখারিনী তাহার সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে বুকে চাপিয়া একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিতেছে। শিশুটির তখনো নাড়ি কাটা হয় নাই। অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠে সে যেন এই দুঃখের পৃথিবীতে আসার প্রতিবাদ করিতেছিল। ভিখারিনী বলিল, 'বাছাকে আমার একটু দুধ দিতে পারছি না বাবু ! এই মাত্র এসেছে বাছা আমার ! আমার বুকে এক ফোঁটা দুধ নেই !' তাহার কণ্ঠে যেন বিশ্ব-জননী কাঁদিয়া উঠিল। পাশের একটি বাবু বেশ একটু ইঙ্গিত করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাবা ! এই ত চেহারা, এক ফোঁটা রক্ত নেই শরীরে, তবু ছেলে হওয়া চাই।'

ভিখারিনী নিষ্পলক চোখে তাকাইয়া রহিল লোকটার দিকে। সে কি দৃষ্টি ! চোখ দুটো তার যেন তারার মত জ্বলিতে লাগিল। ও যেন নিখিল হতভাগিনী নারীর জিজ্ঞাসা ! এমনি করিয়া নির্বাক চোখে তাহারা তাকাইয়া থাকিয়াছে তাহারই দিকে—যে তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। আমি যেন তার দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সে বলিতে চায়, 'পেটের ক্ষুধা এত প্রচণ্ড বলিয়াই তো দেহ বিক্রয় করিয়াও সে ক্ষুধা মিটাইতে হয় !'

যে-লোকটি বিদ্রূপ করিল সে-ই হয়ত ঐ শিশুর গোপন পিতা ! সে না হয়, তারই একজন আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু অথবা তাহারই মত মানুষ একজন ঐ শিশুর জন্মদাতা।

ঐ যে এক আকাশ তারা, উহারা ইহারই মত দুর্ভাগিনী ভুখারিনীদের চোখ, অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ-তৃপ্ত বিশ্ববাসীকে কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে।

তিনদিন পরে আবার দেখিলাম, পথে দাঁড়াইয়া সেই ভিখারিনী। এবার তাহার বক্ষ শূন্য। চক্ষুও তাহার শূন্য। যেদিন শিশু ছিল তার বুকে, সেদিন চক্ষে তার দেখিয়াছিলাম বিশ্বমাতার মমতা। অনন্ত নারীর করুণা সেদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার চোখের তারায়, তাই সে সেদিন অমন সিক্ত কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছিল। আজ তাহার মনের মা বুঝি-বা মরিয়া গিয়াছে তাহার শিশুর সাথে। আজও সে ভিক্ষা

চাহিতেছে, কিন্তু আর সে কাতরতা নাই তাহার কণ্ঠে, আজ যেন সে চাহিবার জন্যই চাহিতেছে! ...

আমায় সে চিনিল। আমি সেদিন তাহাকে আমার ট্রাম ভাড়ার পয়সা ছয়টি দিয়াছিলাম।—ভিখারিনীর শুষ্কচক্ষে হঠাৎ অশ্রুপুঞ্জ দুলিয়া উঠিল! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোর ছেলে কোথায়?' সে ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। তাহার পর একটু থামিয়া আমায় বলিল, 'বাবু, আমার সাথে একটু আসবেন?' আমি সাথে সাথে চলিলাম।

পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তারই পাশে ডাস্টবিন। শহরের যত আবর্জনা জমা হয় ঐ ডাস্টবিনে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভিখারিণী ডাস্টবিনের অনেকগুলো আবর্জনা তুলিয়া ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো কি একটা যেন তুলিয়া লইয়া 'যাদু আমার সোনা আমার' বলিয়া উন্মাদিনীর মত চুমা খাইতে লাগিল।

এই তাহার খোকন।—এই তাহার যাদু, এই তাহার সোনা! ভিখারিনী ইহার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর শিশুটিকে আবার ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, 'বাবু, ঐ পয়সা কয়টি দিয়ে সেদিন একটা খারাব-হয়ে-যাওয়া বার্লির টিন কিনেছিলুম। এ-কয়দিন ছেলেটাকে দিয়েছি ঠাণ্ডা জলে গুলে শুধু ঐ পচা বার্লি, আমিও খেয়েছি একটু করে—যদি আমার বুকে দুধ আসে! দুধ এল না এই হাড়-চামড়ার শরীরে! এক ফোঁটা দুধ পেলে না বাছা আমার, এই তিন দিনের মধ্যে! শেষে আর বার্লিও দিতে পারলুম না, আজ সে চলে গেল! ভালোই হয়েছে, বাছা আমার এবার খুব বড় লোকের ঘরে জন্মায় যেন। একটু পেটে দুধ খেয়ে বাঁচবে!'

চলে গেল ভিখারিনী আবার ভিক্ষা মাগতে!

ডাস্টবিন হইতে ভিখারিনীর পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া আমি চলিলাম গোরস্থানের দিকে। ...

কাল এমনি করিয়া প্রতি বৎসর বাংলার দশ লক্ষ সন্তানের মরা লাশ বুকে ধরিয়া চলিতেছে শ্মশানের পানে, গোরস্থানের পথে।

যাইতে যাইতে দেখিলাম, সেদিনো মন্দির আর মসজিদের ইঁট-পাথরের স্তূপ লইয়া হিন্দু-মুসলমান সমানে কাটাকাটি করিতেছে।

শিশুর লাশ-কোলে আমি বহুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শিশুর লাশ যেন একটা প্রতিকার প্রার্থনা, একটা কৈফিয়ত তলবের মত দেখাইতে লাগিল। ধর্ম-মদান্ধদের তখন শিশুর লাশের দিকে তাকাইয়া দেখিবার অবসর ছিল না। তাহারা তখন ইঁট-পাথর লইয়া বিভৎস মাতলামি শুরু করিয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া যুগে যুগে ইহারা মানুষকে অবহেলা করিয়া ইঁট-পাথর লইয়া মাতামাতি করিয়াছে। মানুষ মারিয়া ইঁট-পাথর বাঁচাইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-জননী তাহার দশ লক্ষ অনাহার-জীর্ণ রোগশীর্ণ অকালমৃত সন্তানের লাশ লইয়া

ইহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই! ইহারা মানুষের চেয়ে ইট-পাথরকে বেশি পবিত্র মনে করে! ইহারা ইট-পূজা করে! ইহারা পাথর-পূজারী!

ভূতে-পাওয়ার মতো ইহাদেরে মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদেরে মসজিদে পাইয়াছে! ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে!

যে-দশ লক্ষ মানুষ প্রতি বৎস মরিতেছে শুধু বাংলায়, —তাহারা শুধু হিন্দু নয়, তাহারা শুধু মুসলমান নয়, তাহারা মানুষ—স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি!

মানুষের কল্যাণের জন্য ঐসব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্টি হয় নাই। আজ যদি আমাদের মাতলামির দরুন ঐ ভজনালয়ই মানুষের অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠে—যাহার হওয়া উচিত ছিল স্বর্গমর্ত্যের সেতু—তবে ভাঙ্গিয়া ফেল ঐ মন্দির-মসজিদ! সকল মানুষ আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচুক এক আকাশের ছত্রতলে, এক চন্দ্র-সূর্য-তারা-জ্বালা মহামন্দিরের আঙ্গিনাতলে!

মানুষ তাহার পবিত্র পায়ে-দলা মাটি দিয়া তৈরি করিল ইট, রচনা করিল মন্দির-মসজিদ। সেই মন্দির-মসজিদের দুটো ইট খসিয়া পড়িল বলিয়া তাহার জন্য দুই শত মানুষের মাথা খসিয়া পড়িবে? যে এ কথা বলে, আগে তাহারই বিচার হউক।

দুইটা ইটের ঋণ যদি দুই শত মানুষের মাথা দিয়া পরিশোধ করিতে হয়, তবে বাঙালি জাতির যে এই বিপুল দেহ-মন্দির হইতে দশ লক্ষ করিয়া মানুষ খসিয়া পড়িতেছে প্রতি বৎসরে শোষণ-দৈত্যের পেষণে, এই মহা-ঋণের পরিশোধ হইবে কত লক্ষ মানুষের মাথা দিয়া?

মন্দির-মসজিদের চূড়া আবার গড়িয়া উঠিবে এই মানুষেরই পায়ে-দলা মাটি দিয়া, পবিত্র হইয়া উঠিবে এই মানুষেরই শ্রমের পবিত্রতা দিয়া; শুধু তাহারাই আর ফিরিয়া আসিবে না, যাহারা পাইল না একটু আলো, একটু বাতাস, এক ফোঁটা ওষুধ, দু'চামচ জল-বার্লি! যাহারা তিলে তিলে মরিয়া জাতির হৃদয়হীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে! যাহাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়া সমগ্র জাতি মরিতেছে তিলে তিলে!

আমি ভাবি, যখন রোগ-শীর্ণ জরা-জীর্ণ অনাহার-ক্লিষ্ট বিবস্ত্র বুভুক্ষু সর্বহারা ভুখারিদের দশ লক্ষ করিয়া লাশ দিনের পর দিন ধরিয়া ঐ মন্দির-মসজিদের পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তখন ধসিয়া পড়ে না কেন মানুষের ঐ নিরর্থক ভজনালয়গুলো? কেন সে ভূমিকম্প আসে না পৃথিবীতে? কেন আসে না সেই রুদ্র—যিনি মানুষ-সমাজের শিয়াল-কুকুরের আড্ডা ঐ ভজনালয়গুলো ফেলবেন গুঁড়িয়ে? দেবেন মানুষের ট্রেডমার্কার চিহ্ন ঐ টিকি-টুপিগুলো উড়িয়ে?

মন্দির-মসজিদের সামনে বাজনা বাজাইলে হয় তার প্রতিকার, আসে তার জন্যে মুদ্রা হাজার হাজার, আসে তার জন্য ছপ্পর ফুঁড়িয়া নেতার দল—গো-ভাগাড়ে শকুনি পড়ার মত!—শুধু দশ লক্ষ লাশের আর প্রতিকার হইল না!

মানুষের পশু-প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্ম-মদান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল।

সকল কালে সকল দেশে সকল লাভ-লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাংলার তরুণের দল—ওগো আমার আগুন খেলার নির্ভীক ভাইরা, ঐ দশ লক্ষ অকালমৃতের লাশ তোমাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ! তারা প্রতিকার চায় !

তোমরা ঐ শকুনির দলের নও, তোমরা আগুনের শিখা, তোমাদের জাতি নাই। তোমরা আলোর, তোমরা গানের, তোমরা কল্যাণের। তোমরা বাহিরে এস, এই দুর্দিনে তাড়াও ঐ গো ভাগাড়ের পড়া শকুনির দলকে।

আমি শুনিতেছি মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা এক সাথে উত্থিত হইতেছে ঊর্ধ্বে—স্রষ্টার সিংহাসনের পানে। আমি দেখিতেছি, সারা আকাশ যেন খুশি হইয়া উঠিতেছে।

হিন্দু-মুসলমান

একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন, দেখো, যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে?

হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে আমার বারেবারে গুরুদেবের ঐ কথাটাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উদয় হয় মনে যে, এ-ন্যাজ গজালো কি করে? এর আদি উদ্ভব কোথায়? ঐ সঙ্গে এটাও মনে হয়, ন্যাজ যাদেরই গজায়—তা ভিতরেই হোক আর বাইরেই হোক—তারাই হয়ে ওঠে পশু। যেসব ন্যাজওয়ালা পশুর হিংস্রতা সরল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে—শৃঙ্গরূপে, তাদের তত ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় হয় সেই সব পশুদের দেখে—যাদের হিংস্রতা ভিতরে, যাদের শিং মাথা ফুটে বেরোয়নি ! শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গহীন ব্যাঘ্র-ভল্লুক জাতীয় পশুগুলো বেশি হিংস্র—বেশি ভীষণ। এ হিসেবে মানুষও পড়ে ঐ শৃঙ্গহীন বাঘ-ভালুকের দলে। কিন্তু, বাঘ-ভালুকের তবু ন্যাজটা বাইরে, তাই হয়তো রক্ষে। কেননা, ন্যাজ আর শিং দুই-ই ভেতরে থাকলে কী রকম হিংস্র হয়ে উঠতে হয়, তা হিন্দু-মুসলমানের ছোরা-মারা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।

যে প্রশ্ন করছিলাম, এই যে ভেতরের ন্যাজ, এর উদ্ভব কোথায়? আমার মনে হয় টিকিতে ও দাড়িতে। টিকিপুর ও দাড়ি-স্তানই বুঝি এর আদি জন্মভূমি। পশু সাজবার মানুষের একি 'আদিম' দুরন্ত ইচ্ছা ! —ন্যাজ গজাল না বলে তারা টিকি দাড়ি জন্মিয়ে যেন সান্ত্বনা পেল।

সে দিন মানব-মনের পশু-জগতে না জানি কী উৎসবের সাড়া পড়েছিল, যে দিন ন্যাজের বদলে তারা দাড়ি-টিকির মতো কোনো কিছু একটা আবিষ্কার করলে!

মানুষের চিরন্তন আত্মীয়তাকে এমনি করে বৈরিতায় পরিণত করা হলো দেওয়ালের পর দেওয়াল খাড়া করে। ধর্মের সত্যকে সওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্র যুগে যুগে অসহনীয় হয়ে উঠেছে বলেই তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানুষও বিদ্রোহ করেছে। হিন্দুত্ব-মুসলমানত্ব দুই-ই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব। তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ারে কোনো দিনই ঠোকাঠুকি বাঁধবে না, কারণ তাঁরা দুইজনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের ওপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম গিয়ে মিশেছে ওঁর মধ্যে। এত মারামারির মধ্যে এইটুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন মুসলমানও নন। তাঁর টিকিও নেই, দাড়িও নেই। একেবারে 'ক্লিন'। টিকি-দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।

অবতার-পয়গম্বর কেউ বলেননি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রিশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি—আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তেরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রিস্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রিস্ট ক্রিশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহম্মদ-খ্রিস্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে। বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় আমরা সূর্য নিয়ে ঝগড়া করতাম। এ বলতো আমাদের পাড়ার সূর্য বড়; ও বলতো আমাদের পাড়ার সূর্য বড়! আমাদের গভীর বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক পাড়ায় আলাদা আলাদা সূর্য ওঠে! স্রষ্টা নিয়েও ঝগড়া চলেছে সেই রকম। এ বলছে আমাদের আল্লা; ও বলছে আমাদের হরি। স্রষ্টা যেন গরু-ছাগল! আর তার বিচারের ভার পড়েছে জাস্টিস সার আবদুর রহিম, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির ওপর। আর বিচারের ফল মেডিক্যাল কলেজ গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

নদীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে যখন দেখি, একটা লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ-প্রশ্ন করবার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান। একজন মানুষ ডুবছে, এইটেই হয়ে ওঠে তার কাছে সবচেয়ে বড়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটা হিন্দু—তার জন্য ত তার আত্মপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় না। তার মন বলে, 'আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি—আমারই মতো একজন মানুষকে।'

কিন্তু আজ দেখছি কি? ছোরা খেয়ে যখন খায়রু মিয়া পড়ল, আর তাকে যখন তুলতে গেল হালিম, তখন ভদ্র সম্প্রদায় হিন্দুরাই ছুটে আসলেন, 'মশাই করেন কি? মোচলমানকে তুলছেন! মরুক ব্যাটা!' তারা 'অজাতশ্মশ্রু' হালিমকে দেখে চিনতে পারেনি যে সে মুসলমান। খায়রু মিয়ার দাড়ি ছিল। ছোরা খেয়ে যখন ভুজালি সিং পড়ল পথের উপর তাকে তুলতে গিয়ে তুর্কিছাঁট-দাড়ি শশধর বাবুরও ঐ অবস্থা!

মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে। পশুর ন্যাজ গজিয়েছে ওদের মাথার ওপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে লুঙ্গিকে, মারছে নেঙ্গোটিকে; মারছে টিকিকে, দাড়িকে! বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই!

মানুষ কি এমনি অন্ধ হবে যে, সুনীতি বাবু হয়ে উঠবেন হিন্দু-সভার সেক্রেটারি এবং মুজিবর রহমান সাহেব হবেন তঞ্জিম তব্‌লিগের প্রেসিডেন্ট? ...

রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম, একটা বলদ যাচ্ছে, তার ন্যাজটা গেছে খসে। ওরই সাথে দেখলাম, আমার অতি বড় উদার বিলেত-ফেরত বন্ধুর মাথায় এক য়্যাব্বড় টিকি গজিয়েছে!

মনে হল, পশুর ন্যাজ খসছে আর মানুষের গজাচ্ছে!